প্রাচীন সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চায় নারীর সক্রিয়তা: একটি পর্যালোচনা

নাজনীন সুলতানা নীতি*

সারসংক্ষেপ

সভ্যতার বিবর্তনে নারী ও পুরুষের অনবদ্য অবদান একই সরলরেখা অনুসরণ করে চলছে, একথা বহুল প্রচলিত ও সর্বজনবিদিত হলেও পুরুষশাসিত বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নারীর সৃষ্টিশীল চিন্তাধারার প্রসঙ্গ অনেকটা যেন আরোপিতভাবেই অবতারণা করতে হয়। অথচ সভ্যতার সূত্রপাত যে কৃষি অর্থনীতির মধ্য দিয়ে হয়েছিল সে অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ তৈরি করেছিল এই নারীই। যুগে যুগে বিভিন্ন সভ্যতায় নারী শুধুমাত্র গৃহে পারিবারিক জীবনেই নিজের অপরিহার্য অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকেনি, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা, আধিপত্য ভেঙে সমাজ ও রাজনীতির শীর্ষে যেমনি এসেছে নারী, সৃজনশীল মৌলিক চিন্তাধারার বিকাশেও তার মেধার স্বাক্ষর তেমনি দেদীপ্যমান। দুঃখজনক বিষয় হলো, ইতিহাসের আলোচনায় দীর্ঘদিন ধরে জ্ঞানচর্চায় নারীর মৌলিকত্ব জনসমাজে আলোর মুখ দেখেনি। ফলে সভ্যতার উৎকর্ষ অর্জনের পেছনে মানব সংগ্রামের অর্ধেকটা এখনো অনেকটা অজানাই থেকে গেছে। তবে প্রচেষ্টা থেমে নেই। সময়ের সাথে সাথে মানসিকতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষ অনেক ঐতিহাসিক সত্যই এখন উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মৌলিক তথ্য উন্মোচিত হচ্ছে। প্রাচীন বিভিন্ন সভ্যতায় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে নারীদের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্যণীয় যার প্রভাব আধুনিক বিশ্বেও স্পষ্ট। বর্তমান প্রবন্ধে কিছু সত্যানুসন্ধানের তাগিদ থেকে প্রাচীন সভ্যতায় জ্ঞানের অন্যতম প্রধান শাখা বিজ্ঞানচর্চায় নারীর স্বকীয়তা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

কনফুসীয় মতবাদ সম্বলিত পাঁচটি ক্লাসিকসের অন্যতম লিজি বা দ্য বুক অফ রাইটস গ্রন্থের একটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল: "নারীর মূল কাজ আনুগত্য,

* শিক্ষক (ইতিহাস), সমাজবিজ্ঞান ও জেন্ডার অধ্যয়ন বিভাগ, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, পিএইচডি শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শৈশব কৈশোরে পিতার, বিয়ের পর স্বামীর এবং বিধবা হওয়ার পর পুত্রের, এই আনুগত্য হবে প্রশ্নাতীত এবং একচ্ছত্র" (Yuan, 2002: 107-29)। প্রাচীন চীনে নারীদের জন্য স্বতঃসিদ্ধ এই তিনটি আদেশ চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস থেকে শুরু করে তাঁর শিষ্য ও অনুসারী বিজ্ঞজনের মধ্যে সকলেই নিজস্ব চিন্তা ও দর্শন অনুযায়ী সমর্থন ও ব্যাখ্যা করেছেন যার প্রভাব বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চীনের সমাজ ব্যবস্থায় শেকড়বদ্ধ হয়েছিল। দার্শনিক কনফুসিয়াসের (৫৫১-৪৭৯ খ্রিষ্টপূর্ব) অন্যতম একটি বিখ্যাত উক্তি ছিল, "নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাই একজন সভ্য নারীর পরিচয়" (Gao 2003: 114–25)। নারীর মাতৃরূপ ছাড়া অন্য কোনো রূপকে স্বীকার করেননি তিনি। চীনের প্রাচীন রীতিনীতির সমর্থক কনফুসীয়বাদ খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত সেখানকার প্রতিটি সামন্ত রাজবংশ কর্তৃক সামাজিক মতাদর্শ হিসেবে অনুসৃত হতো (Gao, 2003: 114–25)। আরো প্রাচীনকালে বৈদিক যুগের ভারতে কন্যাশিশুর জন্মই অকাম্য ছিল। সেখানে নারী শিক্ষার বিষয়টি যে অবহেলিত থাকবে তা স্বাভাবিকভাবেই অনুমেয়। মনুস্মৃতি, অথর্ববেদ, উপনিষদ ও যজুর্ববেদেও নারীকে মা ও স্ত্রী হিসেবেই দেখা হয়েছে। কিছু ব্যতিক্রম ছিল অবশ্যই। তবে নারীর সামাজিক অবস্থান মূলত পারিবারিক পরিচয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে নারীদের প্রতি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র বিশেষ ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ কোনো বিষয় নয়, বরং প্রাচীনকাল থেকে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রায় সকল সমাজ ব্যবস্থাতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কম-বেশি বিদ্যমান ছিল এবং আধুনিক যুগে এসেও এ মনস্তত্ত্বের খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি। তবে আশার বিষয় হলো নারী এসব দৃষ্টিভঙ্গির পরোয়া না করে যুগে যুগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের সর্বত্র সব কাজে তার সাহসিকতার পরিচয় দেখিয়েছেন। নারীর অবমূল্যায়নের যে ধারাবাহিকতা বরাবর লক্ষণীয় তা প্রাগৈতিহাসিক সমাজব্যবস্থায় উপস্থিত ছিল না। সেসময় নারী-পুরুষ দলবদ্ধভাবে শিকার থেকে শুরু করে সব ধরনের কাজে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করত। যাযাবর জীবনব্যবস্থা থেকে যখন মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শুরু করল, বিশেষ করে নারী যখন থেকে কৃষি ও কাপড় বোনার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং নিজেদের মেধা ও শ্রম দ্বারা এসব কাজ করতে থাকেন, তখন থেকেই মূলত শ্রম বিভাজনের মধ্য দিয়ে পরিবারে নারীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষির উদ্ভব নারীর মাধ্যমে হলেও লাঙলের আবিষ্কারের পর কৃষির বিকাশে পুরুষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে বিভিন্ন প্রাচীন সমাজে কৃষিকাজ করতে দেখা যেত নারী-পুরুষ উভয়কেই (বর্মণ, ২০১৬: ২০-২২)। সুতরাং একটি বিষয় নিশ্চিত যে, সভ্যতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শুভ সূচনায় বুদ্ধি ও মেধার প্রয়োগে নারী-পুরুষের ভূমিকা সমান ছিল। তবে বিভিন্ন সভ্যতা বিকাশের পর নারীর সামাজিক অবস্থান বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছিল, যার গভীর প্রভাব জ্ঞানের জগতে নারীর সক্রিয়তার ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। কেননা জ্ঞানচর্চায় নারীর

অংশগ্রহণ আর সমাজে নারীর অবস্থান এই দুইয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। যেসব সভ্যতায় সামাজিকভাবে নারীকে উঁচু মর্যাদা দেয়া হতো কিংবা যেখানে নারীশিক্ষার অবাধ সুযোগ ছিল, সেখানেই নারী সৃষ্টিশীল চিন্তার জগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। যদিও প্রাচীনযুগের বিশিষ্ট নারীদের সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে জানবার জন্য খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। এর পেছনে একটি বড় কারণ হতে পারে সামাজিকভাবে নারীর অবস্থান মর্যাদাপূর্ণ না হওয়া, যার দরুন যে-কোনো জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নারীকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা জাতিসত্তার মতোই অনেকটা 'আউটসাইডার' বা বহিরাগত (Schiebinger, 1987: 305-32), সোজা কথায় অনাকাঙ্ক্ষিত হিসেবে গণ্য করা হতো। ফলে অনেক নারীর চিন্তা ও দর্শনের লিখিত প্রমাণ হয় হারিয়ে গিয়েছে, নয়তো তাদের মতাদর্শ কোনো পুরুষ আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে উদ্ধৃত হয়েছে। এতে করে তাদের মতবাদ বা চিন্তাধারা সম্বলিত কিছু প্রাথমিক উৎস পাওয়া গেলেও সেগুলোর মৌলিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে। উৎসের অপ্রতুলতা এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে নানা সংশয় থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন বিভিন্ন সভ্যতায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয়তার যেটুকু মৌলিক অথচ বিক্ষিপ্ত চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা এক কথায় যুগান্তকারী এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিক্ষিপ্ত চিত্রকে একত্রিত করে একটি পর্যালোচনা ভিত্তিক মূল্যায়ন উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বেশ কিছু উন্নত সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, যারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্বের পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রাচীনত্বের দিক থেকে এসব সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চায় নারীর সক্রিয়তা প্রসঙ্গে নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

মানব সভ্যতার আদি ভূমি আরব মরুভূমির উত্তরাঞ্চলে ৪০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পর গড়ে ওঠা মেসোপটেমীয় সভ্যতায় বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময় সুমেরীয়, আক্কাদীয়, ব্যাবিলনীয়, এসেরীয় ও ক্যালডীয় সভ্যতা গড়ে তুলেছিল (হোসেন ও শিকদার, ২০০৪: ১৩২)। এ অঞ্চলে গড়ে ওঠা সভ্যতাগুলোর মধ্যে সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় নারীরা আইনগতভাবেই কিছু সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতেন (২০০৪: ১৩৪)। তবে বিজ্ঞানচর্চায় এই সভ্যতাগুলোতে নারীর তেমন সক্রিয়তা ছিল না। মাটির তৈরি একটি প্রাচীন লিপিফলক থেকে এনহেদুয়ান্না বা এনহেদুয়ানা নামে একজন মেসোপটেমীয় রাজকুমারী সম্পর্কে জানা যায় যিনি প্রাচীন পৃথিবীর প্রথম নারী জ্যোতির্বিদ ছিলেন। সম্ভবত ২৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সুমের অঞ্চলে বাস করতেন এবং তাঁর পিতা ছিলেন আক্কাদীয় রাজা প্রথম সারগন দ্য গ্রেট (২৩৩৫-২২৭৯ খ্রিষ্টপূর্ব)। তিনি এনহেদুয়ান্নাকে শহরের সর্বোচ্চ পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন, যা অত্যন্ত সম্মানিত একটি পদ ছিল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মেসোপটেমীয় সভ্যতায় পুরোহিতরাই প্রধান ভূমিকা পালন করতেন। পবিত্র মন্দিরগুলোতে তাঁরা শুধুমাত্র জ্ঞানের আধার হিসেবেই দায়িত্ব পালন করতেন না,

সেই সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও হস্তশিল্পসহ সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁরা দিকনির্দেশনাও প্রদান করতেন। এ ধরনের কাজের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানমূলক জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। এনহেদুয়ান্না এ ধরনের দায়িত্ব পালন করতেন বলে জানা গেছে। দুঃখজনকভাবে, তাঁর কাজ সম্পর্কিত প্রামাণ্য তথ্য অপ্রতুল। পিতা কর্তৃক সর্বোচ্চ পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি সাম্রাজ্যের অন্যান্য পুরোহিতদের নিয়ে চন্দ্র ও নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করেছিলেন। ব্যাবিলনীয় বর্ষপঞ্জি নির্মাণে যে ধরনের পর্যবেক্ষণ ও গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল তার একটি অংশ এনহেদুয়ান্নার সময়কালে হয়েছিল। ধারণা করা হয়, এ ধরনের কাজে তাঁর ভূমিকাও নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু মেসোপটেমীয় সমাজ কাঠামোতে সবকিছুই রাজা ও ধর্মকেন্দ্রিক হওয়াতে কোনো ব্যক্তি বিশেষের কাজ পরিচিতিসহ সংরক্ষিত হতো না, যা এনহেদুয়ান্নাসহ বেশিরভাগ মেসোপটেমীয় জ্যোতির্বিদদের বিশিষ্টতার পরিচয় না পাওয়ার একটি বড় কারণ। এনহেদুয়ান্নার ৪৮টি কবিতা বা স্তোত্র গীত পাওয়া গেছে যার মধ্যে একটি কবিতায় তিনি বলেছেন– "প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী একজন সত্যনিষ্ঠ নারী ল্যাপিস লাজুলির লিপিফলক নিয়ে চর্চা করেন, পুরো ভূখন্ডকে উপদেশ প্রদান করেন, স্বর্গ ও ভূমির পরিমাপ করেন।" (Bernardi, 2016: 3-5)। কবিতাটি সমাজে তাঁর গুরুত্বের পাশাপাশি জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর বিশেষত্বেরও প্রমাণ

এরপর ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের একটি কিউনিফর্ম লিপিফলক থেকে মেসোপটেমীয় ব্যাবিলনে তাপুতি-বেলাতেকাল্লিম নামে একজন নারী রসায়নবিদ সম্পর্কে জানা যায় যিনি প্রাসাদ পরিদর্শক এবং একজন সুগন্ধি প্রস্তুতকারী ছিলেন। তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম পাতন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ফুলের নির্যাস ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য সংগ্রহ করে তাতে পানি মিশিয়ে রকমারি সুগন্ধি প্রস্তুত করতেন। সুগন্ধি তৈরির প্রথম গবেষণামূলক লেখাটি তিনিই লিখেছিলেন যদিও সেটি হারিয়ে গিয়েছে। তবে প্রাপ্ত শিলালিপিটিতে তাপুতির সঙ্গে নিনু (এই নামের প্রথম অংশ পাওয়া যায় নি) নামে একজন নারীর উল্লেখ রয়েছে এবং তাঁদের উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসে ক্যালামুস গাছ, গন্ধরস, তেল ও ফুলের সংমিশ্রণে তৈরি একটি সুগন্ধি মলম প্রস্তুত প্রণালী এখনও টিকে আছে (Helmenstine, 2021)।

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে অন্যতম মিশরীয় সভ্যতায় নারীরা উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতেন। সামাজিক ও আইনগতভাবে নারীর মর্যাদা পুরুষের সমান ছিল বলে তারা শিক্ষার অধিকারের পাশাপাশি সম্পত্তি ও ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হতেন (হোসেন ও শিকদার, ২০০৪: ১০৪)। সেই সাথে মিশরীয় বিভিন্ন তথ্যাদি অনুসন্ধানে দেখা যায়, সেখানে নারীদের চিকিৎসা প্রশিক্ষণের বিষয়টি খুব স্বাভাবিক বিষয় ছিল। তারা রাজচিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হতেন। প্লিনিসহ আরও অনেকের লেখা থেকে হলিওপলিসে (আধুনিক কায়রোর সন্নিকটে) একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায়। এখান থেকে স্নাতক সম্পন্নকারীরা ভালো বেতনে সরকারি অফিসে

চাকরি করতেন এবং বিনামূল্যে দরিদ্রদের চিকিৎসা প্রদান করতেন। ইউরিপিডিস ও হেরোডোটাসের স্তুতিমূলক লেখাগুলোতে চিকিৎসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মিশরে প্রথম নারী চিকিৎসক মেরিট-পিটাহের সন্ধান মেলে পুরাতন রাজত্বের সময় পঞ্চম রাজবংশের রাণী নেফেরিরিকার শাসনামলে খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩০ অব্দে। বলা হয়, মেম্ফিসের নিকটবর্তী সাক্কারায় তাঁর পুত্রের সমাধির ওপর লেখা একটি শিলালিপিতে 'প্রধান চিকিৎসক' হিসেবে তাঁর উল্লেখ পাওয়া গেছে যদিও তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ তাঁর পেশা ও গুরুত্বের কোনো পরিচয় বহন করে না (Mead, 1938: 16)। সম্প্রতি বেশ কিছু গবেষণায় মেরিট-পিটাহের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, পুরাতন রাজবংশের সময় এই নামের অস্তিত্ব থাকলেও প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসক কিংবা নারী প্রশাসকের কোনো তালিকায় নামটি পাওয়া যায় নি (Kwiecinski, 2019: 83-106)। এমনকি যে জায়গায় মেরিট-পিটাহের সমাধি আছে বলে দাবি করা হয়েছে সেখানে পুরাতন রাজবংশে কোনো সমাধিরই সন্ধান পাওয়া যায় নি। নতুন রাজবংশের সময়কালে থিবসের শাসক রামোসের সমাধির ওপর মেরিট-পিটাহ নামে একজন নারীর উল্লেখ রয়েছে, যিনি রামোসের স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি কোনো চিকিৎসক ছিলেন না। ধারণা করা হয়, পুরাতন রাজবংশের সময় পেশেশেত একজন রাজমাতা যিনি পুরোহিতদের পরিদর্শক ছিলেন। উভয়ের মধ্যে কিছু তথ্যগত মিল থাকায় পেশেশেতের সঙ্গে সম্ভবত মেরিট-পিটাহকে ভুলবশত মিলিয়ে ফেলা হয়েছে (Kwiecinski, 2019: 83-106)। সেদিক থেকে পেশেশেত মিশরীয় সবচেয়ে প্রাচীন নারী চিকিৎসক। তিনি মিশরে ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সময় বেঁচে ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মূলত গিজায় তাঁর পুত্র আখেট-হেটেপের মাস্তাবা সমাধি থেকে জানা গেছে। তিনি নারী চিকিৎসকদের পরিদর্শক ছিলেন খুব সম্ভব পুরুষ চিকিৎসকদেরও। তবে তাঁর চিকিৎসা অনুশীলনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। যদিও তাঁর পদবী অনুযায়ী বোঝা যায় তৎকালে একাধিক নারী চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু কোনো বিশিষ্ট ধাত্রী বা ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী চিকিৎসকের কোনো প্রমাণ মেলেনি (Harer and El-Dawakhly, 1990: 290)। এরপর খ্রিষ্টপূর্ব ১৯০০ অব্দের দিকে মধ্যবর্তী রাজত্বের সময় (প্রায় ২০০০- ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্ব) আগানিস (অন্যান্য লিখিত উৎসে আথিরতা উল্লিখিত) নামে একজন মিশরীয় রাজকুমারীকে জ্যোতির্বিদ্যা ও প্রাকৃতিক দর্শন নিয়ে কাজ করতে দেখা যায়। প্রাচীন বিভিন্ন ধর্মীয় উৎস অনুযায়ী তাঁকে রাজা প্রথম সেসোসত্রিস বা দ্বাদশ বংশের সেসোসত্রিসের বোন বা কন্যা (Bernardi, 2016:9) হিসেবে মনে করা হয়। তবে নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন, আর সেলেসটিয়াল বা আকাশ সম্পর্কিত গোলকের সাহায্যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা ছাড়া আগানিসের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার কার্যক্রম সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। সেক্ষেত্রে বিষয়টিকে তৎকালীন মিশরে বিজ্ঞানকে যেভাবে বিবেচনা করা হতো, সেই কাঠামোর আওতায় নিয়ে চিন্তা করতে হবে। মিশরীয়রা

প্রথমদিকে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকের প্রতি আগ্রহী ছিল। পবিত্র মন্দিরের পুরোহিতগণ গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার ব্যবহার করতেন মূলত কৃষি বর্ষপঞ্জি, সেচ, গম সংরক্ষণ, স্মৃতিস্তম্ভ বা সীমানা নির্দেশক নির্মাণের পাশাপাশি মন্দির ও স্থাপত্যের কাজে ব্যবহৃত পাথর কাটার কাজে। তাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানমূলক জ্ঞানের বিবরণ সম্বলিত কোনো গাণিতিক প্যাপিরাস পাওয়া যায় নি। সুতরাং, যেটুকু জানা যাচ্ছে তা মূলত ধর্মীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানমূলক পর্যবেক্ষণ সম্বলিত একটি গ্রন্থ 'বুক অফ নাট', বিভিন্ন চিত্র ও সমাধিতে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। তৎকালীন সমাজে বিজ্ঞান ও ধর্ম অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ছিল। ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে ব্যাখ্যাগুলো পাওয়া যায়, তা আজকের জ্যোতিষবিদ্যার সঙ্গেও তুলনা করা যায়। এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে আগানিসের বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে (Bernardi, 2016: 14)।

মেসোপটেমীয় এবং মিশরীয় সভ্যতার পতনের পর দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে জ্ঞানচর্চার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল বিশেষ করে প্রাচীন ভারতে আনুমানিক ৩৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে জানা যায় না। এ সভ্যতায় নারীর সামাজিক অবস্থান মর্যাদাপূর্ণ ছিল। ভারতে বৈদিক যুগে নারী শিক্ষার কিছু প্রসার হয়েছিল। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে নারীর স্বাধ্যায়ের অধিকার ছিল এবং তার জন্য তার উপনয়নও হতো। তবে কোনো নারী গুরুগৃহ থেকে শিক্ষালাভ করেছে– এমনটি জানা যায় নি। তবে কিছু ব্যতিক্রম ছিল। শিক্ষার মূল মাধ্যম ছিল বেদ। এ সময় গার্গী বাচকদেবী, মৈত্রেয়ী, অপলা, উর্বশী, সুলভা, ঘোষা, লীলাবতী, শাশ্বতীর মতো অনেক বিদুষী ও শাস্ত্রজ্ঞ নারীর আবির্ভাব ঘটেছিল যারা সমকালীন অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে বিভিন্ন বিতর্ক ও আলোচনায় লিপ্ত হতেন। বেদ ও উপনিষদের বিভিন্ন লিখিত উৎসে তাঁদের জ্ঞানের গভীরতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিস্তারিত বিবরণ অপ্রতুল। লীলাবতী একজন বিখ্যাত গণিতবিদ ছিলেন বলে জানা যায় (Goel, 2020: 26-29)। গার্গী একজন প্রকৃতি দার্শনিক হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বৃহদারণ্য কোপনিষদে বলা হয়েছে, বিদেহর রাজা জনক রাজসূয়যজ্ঞের আয়োজন করে ভারতের জ্ঞানী-গুণী প্রথিতযশা ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেছিলেন যাঁদের মধ্যে গার্গী ছিলেন অন্যতম। আয়োজনে বিখ্যাত পন্ডিত যাজ্ঞবল্ক্যের সাথে গার্গী অধিবিদ্যা, বাস্তবতার উৎস, স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক করেছিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য নিয়ে বিবিধ প্রশ্ন উপস্থাপন করেন যা এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচায়ক (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৮৪২-৪৮)।

চৈনিক সভ্যতার ক্ষেত্রেও তথ্যের অপর্যাপ্ততার কথাই বলতে হয়। যেটুকু আছে সেটি অসম্পূর্ণ চিত্র। প্রাচীন চীনে নারীদের সম্মানজনক অবস্থান ছিল বলে জানা

যায়। তারা বেশ স্বাধীনতাও ভোগ করতেন (হোসেন ও শিকদার, ২০০৪: ২৭১)। তবে চিকিৎসা ছাড়া বিজ্ঞানের অন্য কোনো শাখায় তাদের সক্রিয়তা সম্পর্কে সম্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। চিকিৎসা পেশায় প্রাচীন চীনে অনেক নারীই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মিং রাজবংশের পূর্বেই চীনে প্রচুর নারী চিকিৎসক ছিলেন। হান রাজবংশের (খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী) শাসনামলে প্রথম নারী চিকিৎসক ছিলেন ই যু (Yi Xu)। তিনি আকুপাংচার এবং উদ্ভিদ থেকে ঔষধ তৈরির প্রক্রিয়া অত্যন্ত দক্ষভাবে জানতেন। তিনি মূলত রাজদরবারে রাজমাতার চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। উল্লেখ্য, চীনে রাজপরিবারের নারী সদস্যদের জন্য একমাত্র নারী চিকিৎসক নিয়োগ করা হতো। প্রাচীন চীনে যথেষ্ট নারী চিকিৎসক থাকার প্রধান কারণ এটি। ই যু সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জানা যায় যে, তিনি তাঁর সততা ও দক্ষতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। ই যু'র পর চুন জু ইয়ান (chun Yu Yan) সম্পর্কে জানা যায়, তিনিও রাজবংশে কাজ করতেন এবং ধাত্রীবিদ্যা ও পাথর অপসারণ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। (Santilli, 2017: 285-301)।

অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নারী সক্রিয় ছিলেন গ্রীক সভ্যতায়। অথচ গ্রীসে নারীদের সামাজিক অবস্থান অত্যন্ত অমর্যাদাপূর্ণ ছিল। সমাজে নারীর চারটিই নির্ধারিত চরিত্র ছিল: কন্যা, বোন, মা ও স্ত্রী। সমাজে নারীদের শিক্ষার যেটুকু সুযোগ ছিল, তা উঁচু পারিবারিক মর্যাদার নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারপরও এ সভ্যতায় বেশ কিছু ব্যতিক্রম লক্ষণীয়।

প্রাচীন উৎস অনুযায়ী গ্রীসে আদি পীথাগোরিয় সমাজে নারীদের বেশ সক্রিয় ভূমিকার কথা জানা যায়। প্রথমেই গ্রীক চিকিৎসক আগামিডের (আনুমানিক ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) কথা উল্লেখ করতে হয়। তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি তথ্য জানা যায় মহাকবি হোমারের বর্ণনা থেকে। হোমারের তথ্য অনুযায়ী আগামিড ট্রোজান যুদ্ধের সময় বেঁচে ছিলেন। তাঁর স্বামী একজন তীরন্দাজ ছিলেন। আগামিড বিভিন্ন উদ্ভিদকে চিকিৎসার কাজে ব্যবহারে খুব দক্ষ ছিলেন। হোমারের মতে, আগামিডের পৃথিবীর সব ঔষধি বৃক্ষ চেনার সক্ষমতা ছিল। কোনো কোনো উৎসে তাঁকে পেরিমিড হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে (Ogilvie and Harvey, 1999: 23)। এরপর খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দার্শনিক থিয়ানো প্রসঙ্গে বলা যায়। ধারণা করা হয় তিনি পিথাগোরাসের স্ত্রী ছিলেন। তিনিই পিথাগোরাসের মৃত্যুর পর পীথাগোরিয় মতবাদের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি গণিত, রসায়ন, ঔষধ ও শিশু মনস্তত্ত্বের ওপর গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে জানা গেলেও এ সম্পর্কিত কোনো প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তিনি 'দ্য গোল্ডেন রেশিও' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করা হয় (Deakin, 2013: 3350-64)।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের একজন কিংবদন্তিতুল্য চিকিৎসক ছিলেন এগনোদিস। তিনি গ্রীক চিকিৎসক হেরোফিলাসের কাছে চিকিৎসা বিষয়ক দীক্ষা নেন। তাঁর সম্পর্কে মূলত ল্যাটিন লেখক গাইয়ুস জুলিয়াস হাইজিনাসের গ্রন্থ থেকে জানা যায়– গ্রীসে নারীদের জন্য ঔষধশাস্ত্র চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। বহু নারী পুরুষ ডাক্তারের কাছে যেতে অস্বস্তি বোধ করতেন। ফলে অনেক নারী শিশু জন্মের সময় এবং গোপন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতেন। এগনোদিস এ ধারার পরিবর্তন করেন। তিনি পুরুষের ছদ্মবেশে চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চা ও সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রথমে অনেক নারীই তাঁকে পুরুষ ভেবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এগনোদিস নিজের লৈঙ্গিক পরিচয় তাদের কাছে প্রকাশের পরই তাদের চিকিৎসা করতে সক্ষম হন। এক পর্যায়ে সমাজে তাঁর পরিচয় প্রকাশিত হয়ে গেলে আইন লঙ্ঘনের কারণে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। তখন একদল নারীর প্রতিবাদের মুখে তাঁর মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করতে বাধ্য হন বিচারক। সেই সাথে পুরাতন আইনের স্থলে একটি নতুন আইন তৈরি করা হয় যাতে বলা হয়, যে-কোনো ভদ্রমহিলা নিজ লিঙ্গভিত্তিক চিকিৎসা শাস্ত্র চর্চা করতে পারবেন। যার মধ্য দিয়ে নারীদের বিজ্ঞানচর্চার পথে একটি বড় বাধা অপসারণ হয়েছিল (Kuhlman, 2002: 296)। এরপর গ্রীক সভ্যতায় বিভিন্ন সময়ে অলিম্পিয়াস অফ থিবস, পেরিক্টিওন, সালফে, সতিরা, লিওপার্ডা, লায়েসের মতো অনেক বিজ্ঞানমনস্ক গুণী নারী চিকিৎসাসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। প্রায় ৩৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রীসের মহান নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন আর্টেমিসিয়া। স্ট্রাবো, পিনি, সুইডাস ও থিওফ্রাস্টাসের লেখায় তাঁর ভেষজ ঔষধ প্রস্তুতের প্রশংসা পাওয়া যায়। আর্টিমিসিয়া নামে তিনি একটি উদ্ভিদের নামকরণ করেছিলেন যেটি তিনি গর্ভপাত রোধ ও গর্ভফুলের সুরক্ষায় ব্যবহার করতেন। আবার, গর্ভপাতের জন্যও আর্টেমিসিয়ার আরেকটি প্রজাতির উদ্ভিদ ব্যবহৃত হতো (Ogilvie and Harvey, 1999: 110)।

খ্রিষ্টীয় ২০০ অব্দে গ্রেকো-রোমান বিশিষ্ট চিকিৎসক আসপাসিয়ার নাম চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রীরোগ, প্রসূতি বিজ্ঞান ও শল্যচিকিৎসা সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান সব গবেষণা এক হাজার বছর ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে পথ দেখিয়েছে। তিনি চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন লতাগুল্ম, বীজ ও তেল ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন। গর্ভনিরোধক পন্থাও তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও অন্যান্য শল্যচিকিৎসার পাশাপাশি রক্তনালী চিকিৎসা, ক্ষত সেলাই এবং হার্নিয়া রোগের অস্ত্রোপচারও করতেন (Shearer and Shearer, 1996: 179)।

বেশ কিছু সূত্র অনুযায়ী গ্রীক প্রথম নারী জ্যোতির্বিদ ছিলেন এগলোনিক বা এগলোনিস (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতক)। তিনি ব্যবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে পড়াশোনা করেছিলেন। গ্রীসে নারী শিক্ষার তেমন সুযোগ না থাকলেও এগলোনিকের বাবা কন্যার জ্ঞান অর্জনে কোনো বাধা দেননি (Bernardi, 2016:

27)। তিনি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের স্থান ও সময় নির্ণয় করতে পারতেন, আর সেটি এতটাই নির্ভুল হতো যে স্থানীয়রা মনে করত আগলাওনাইকে ইচ্ছে করলেই চাঁদকে নামিয়ে আনতে পারেন। তাঁর খ্যাতির মাত্রা দেখে বোঝা যায় তিনি মহাকাশবিজ্ঞান ও চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ নিয়ে আগ্রহী ছিলেন, যা অত্যন্ত প্রাচীন একটি বিদ্যা ছিল (Ogilvie and Harvey, 1999: 27)।

গ্রীক সভ্যতার বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভূমধ্যসাগরের মধ্য অঞ্চলে ইতালির টাইবার নদীর তীরে খ্রিষ্টপূর্ব আট শতকে আরেকটি সভ্যতার উত্থান ঘটেছিল রোমান সভ্যতা নামে (হোসেন ও শিকদার, ২০০৪: ৩২৪)। প্রজাতান্ত্রিক রোমের শেষ দুই দশকে রোমের জ্ঞান ও চিন্তার জগত গ্রীক সভ্যতা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে রোমের অবদান খুব সীমিত ছিল। দাসভিত্তিক অর্থনীতি ও দাসতান্ত্রিক ভাবাদর্শ তাদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেনি। এই জায়গায় গ্রীক বিজ্ঞানও তাদের অনুপ্রাণিত করেনি (হোসেন ও শিকদার, ২০০৪: ৩৫৪)। অন্যদিকে নারীদের সামাজিক মর্যাদাও গ্রীসের মতোই ছিল। স্বাভাবিকভাবেই চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত গির্জার কয়েকজন নারী সন্ত ছাড়া বিজ্ঞানচর্চায় নারীদের কোনো অংশগ্রহণ দেখা যায় নি। তবে ৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিশরীয় আলেকজান্দ্রিয়া রোমানদের দখলে চলে আসার পর সেখানে দুটি ভিন্ন সময়ে দুজন মনীষী নারীর জন্ম হয়েছিল যারা বিজ্ঞানচর্চায় অসাধারণ অবদান রেখেছিলেন। তাঁরা ছিলেন খ্রিষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর মারিয়া দ্য জিউয়েস ও খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের হাইপেশিয়া। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রখ্যাত একজন রসায়নবিদ ছিলেন মেরি দ্য জিউয়েস। রোমান সভ্যতায় জ্ঞানশিক্ষার মূল কেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়া উদারতান্ত্রিক মানসিকতার একটি আধুনিক শহর ছিল বলে এখানে নারীদের প্রতি পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা অনেকটাই শিথিল ছিল। রোমান সভ্যতার অংশ হয়েও এ সভ্যতার সংকীর্ণতা আলেকজান্দ্রিয়াকে গ্রাস করতে পারেনি। ফলে এগনোদিক ও মারিয়া দ্য জিউয়েসের মতো নারীরা বিজ্ঞানের জগতে সহজে বিচরণ করতে পেরেছিলেন। মারিয়া রসায়নে তাঁর নিরীক্ষা ও উদ্ভাবন সম্পর্কে একাধিক গবেষণা গ্রন্থ লিখেছিলেন যার সামান্যই আজ টিকে আছে। শুধুমাত্র প্রাচীন আলকেমির সংগ্রহে তাঁর *মারিয়া প্র্যাকটিকা* গ্রন্থের খণ্ডাংশ পাওয়া যায়। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া গেছে গ্রীক রসায়নবিদ জোসিমাসের গ্রন্থ থেকে। ৩০০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত তাঁর ২৮টি বই সম্বলিত রসায়ন বিশ্বকোষ *কেইরোক্মিতা* মারিয়ার চিন্তা ও কৌশলকে ভিত্তি করে লেখা হয়েছিল। মারিয়া তাঁর গ্রন্থে বাস্তব উদাহরণের পাশাপাশি রসায়নের তাত্ত্বিক দিকের সমন্বয় করে পরীক্ষাগারের বিভিন্ন সরঞ্জাম ও প্রক্রিয়ার বিবরণ দিয়েছেন। মারিয়া দ্বি-স্তর বিশিষ্ট চুলা আবিষ্কার করেছিলেন, যা দুই হাজার বছর ধরে পরীক্ষাগারের আবশ্যকীয় বস্তু। ধাতুর ওপর আর্সেনিক, পারদ ও সালফারের বাষ্পীকরণের জন্য কেরোটাকিস নামে বিশেষ ধরনের সিলিন্ডারের উদ্ভাবন করেছিলেন যা উদ্ভিদ থেকে

তেল বের করার জন্যও ব্যবহৃত হতো। মারিয়ার পর রোমান সভ্যতায় রসায়নচর্চার সোনালি দিনের অবসান ঘটে। রোমান সম্রাট ডিওকলেশিয়ান (২৪৫-৩১৩ খ্রিষ্টাব্দ) আলেকজান্দ্রিয়ার রসায়নবিদের হত্যা করেন এবং তাদের সৃষ্টিকর্ম পুড়িয়ে ফেলতে শুরু করেন। যা কিছু বাকি ছিল তা আরবরা সুরক্ষিতভাবে মধ্যযুগে ইউরোপে স্থানান্তরিত করে (Kuhlman, 2002: 315-16)।

বিংশ-শতাব্দীর বিজ্ঞানী মেরি কুরির আগে বহু শতাব্দী ধরে বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ হাইপেশিয়াকে (আনুমানিক ৩৭০-৪১৫ খ্রিষ্টাব্দ) একমাত্র নারী বিজ্ঞানী মনে করা হতো। কেননা তাঁর কাজগুলো যতটা সঠিকভাবে সংরক্ষিত পাওয়া গেছে ইতোপূর্বে অন্য কারোটি পাওয়া যায় নি। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও দর্শন পড়াতেন এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ লেখাই ছিল ছাত্রদের বোঝানোর জন্য, যার অধিকাংশ হারিয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও তাঁর উদ্ভাবন বা তিনি কি পড়াতেন সে সম্পর্কে জানা যায় তাঁর অন্যতম একজন শিষ্য সাইনেসিয়াসের লেখা থেকে। সাইনেসিয়াস হাইপেশিয়ার কাছে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ জানতে চেয়ে চিঠি লিখতেন। হাইপেশিয়া টলেমী রচিত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ আলগামেস্ট ও ডিওফানতুস রচিত গণিত বিষয়ক এরিথমেটিকা গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছিলেন এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে তিনি ও তাঁর বাবা সম্মিলিতভাবে গণিতবিদ ইউক্লিডের ওপর একটি গবেষণা নিবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে সুখ্যাতি রয়েছে এস্ট্রোলেব তৈরির জন্য যা জ্যোতির্বিদদের আকাশে নির্দিষ্ট সময়ে নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। তিনি জল নিষ্কাশন ও জলের স্তর পরিমাপের জন্য এপারেটাস তৈরি করেছিলেন। এছাড়া তিনি তরলের ঘনত্ব পরিমাপের জন্য তামা দিয়ে একটি এয়ারোমিটার তৈরি করেছিলেন। হাইপেশিয়া বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী যুগের শেষ সময়ের প্রতিনিধিত্ব করতেন যা যুক্তির সক্ষমতা ও মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে সমর্থন করত। তৎকালীন খ্রিষ্টীয় সমাজ যৌক্তিক চিন্তার চিন্তার পরিপন্থী ছিল। পরিণতিতে যুক্তিবাদী মুক্ত মন-মানসিকতার অধিকারী হাইপেশিয়াকে কিছু উগ্রপন্থীর হাতে নৃশংসভাবে জীবন দিতে হয়েছিল (Kuhlman, 2002: 278)।

ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার ১৭৬৪ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত বিশ্বকোষভিত্তিক অভিধান *'ফিলোসফিকাল ডিকশনারি'* তে বলেছিলেন, ইতিহাসে "অনেক সাহসী নারী যোদ্ধার মতো অনেক শিক্ষিত নারীও পাওয়া যাবে তবে কদাচিতই কোনো নারী উদ্ভাবক ছিলেন" (Merritt, 1991: 235)। তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে দার্শনিক প্রধোও বলেছেন, "নারী কিছুই উদ্ভাবন করেনি এমনকি তাদের সুতো জড়িয়ে রাখার রিলও নয়" (Bell, 1983:173)। দুজন দার্শনিককেই ভুল প্রমাণিত করে নারী বিজ্ঞানীদের নিয়ে গবেষণার জন্য জ্ঞানচর্চার জগতে 'নারী ও বিজ্ঞান', 'জেন্ডার ও বিজ্ঞান' ইত্যাদি নতুন ক্ষেত্রের সূচনা হয়েছে বিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে, যার মাধ্যমে

উন্মোচিত হয়েছে প্রাচীন নারীর বিজ্ঞানমনস্কতার একাধিক অভিনব দিক। সব সভ্যতাতেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর প্রতিকূলতায় থেকেও নারীর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রয়াস থেমে থাকে নি। সমাজে নারীশিক্ষার আনুকূল্য অথবা পারিবারিক পরিবেশে নারীশিক্ষার আনুকূল্য থাকা সাপেক্ষে প্রাচীন সভ্যতার নারীগণ জ্ঞানচর্চার জগতে স্বেচ্ছায় বিচরণের সুযোগ পেয়েছিলেন। লিখিত ইতিহাসের পুরোটা সময় জুড়ে নারী নানাভাবে বিজ্ঞানের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তাদের জন্য নতুন বা জটিল বিষয় ছিল না যেমনি ছিল না পুরুষের জন্য। বহু বছরের অবহেলা সত্ত্বেও তাঁদের মূল্যবান সৃষ্টিকর্মের যেটুকু সম্প্রতি আলোর মুখ দেখেছে তা তাঁদের মৌলিক জ্ঞানচিন্তাগত উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। আর, এই উৎকর্ষ তৎকালীন সমাজকে যেমনি নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছিল, তেমনি প্রজন্মান্তরে সভ্যতার আধুনিকতর উত্তরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানে নারীর অগ্রযাত্রাকে শিক্ষার্থীদের ব্যাপকভাবে কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য উপযোগী টেক্সটের অপ্রতুলতা লক্ষ্যণীয়। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ নারীর মেধা ও মননকে অনুপ্রাণিত এবং নারীর ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১ হোসেন, ড. আবু মোঃ দেলোয়ার ও শিকদার মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (২০০৪)। *সভ্যতার ইতিহাস: প্রাচীন ও মধ্যযুগ*। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা

২ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, দুর্গাচরণ [সম্পা.] (১৩৪০)। বৃহদারন্যকোপনিষদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)। বি পি এম্‌স প্রেস, কলিকাতা

৩ বর্মণ, রেবতী (২০১৬)। সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ। দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা।

৪ দত্ত, রমেশচন্দ [অনূদিত] (১৯০৯)। *ঋগ্বেদ-সংহিতা* (দ্বিতীয় সংস্করণ)। এল্‌ম্‌ প্রেস, কলকাতা।

৫ Bernardi, Gabriella (2016). *The Unforgotten Sisters*. Springer Publishing, New York, United States

৬ Bell, A. Linda (ed) (1983) '*Visions of Women: Being a Fascinating Anthology with Analysis of Philosophers*' Views of Women from Ancient to Modern Times, Humana press Inc., First edition, New Jersey.

৭ Deakin, Michael A. B. (2013). "Theano: The World's First Female Mathematician?". International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, vol. 44, no. 3. Crossref, doi:10.1080/ 0020739x.2012.729614

৮ Goel, P. (2020). "Women Education in Ancient Times". JS International Journal of Multidisciplinary Research, vol. 2, https://researth.iars.info/ index.php/JSIJMR/article/view/142

৯ Gao, Xiongya (2003). “Women Existing for Men: Confucianism and Social Injustice against Women in China.” Gender &amp, vol. 10, no. 3, www.jstor.org/stable/41675091. Accessed 6 Aug. 2021

১০ Helmenstine, Anne (2021). “Who Was the First Chemist? A Woman Named Tapputi.” Science Notes and Projects. sciencenotes.org/who-was-the-first-chemist.

১১ Hurd-Mead, Kate Campbell (1938). M. D. *A History of Women in Medicine: From the Earliest times to the Beginning of the Nineteenth century.* The Haddam press.

১২ Harer, W. Benson and Z. El-Dawakhly (1990). “Peseshet - The First Female Physician?”. International Journal of Gynecology & Obstetrics, vol. 32, no. 3. Crossref, doi:10.1016/0020-7292(90)90365-r.

১৩ Kuhlman, Erika (2002). A to Z of Women in World History. Revised, Facts on file.

১৪ Merritt, Kwiecinski, Jakub M (2019) “Merit Ptah, ‘The First Woman Physician’: Crafting of a Feminist History with an Ancient Egyptian Setting.” Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, vol. 75, no. 1. Crossref, doi:10.1093/jhmas/jrz058.

১৫ Deborah J (1991). *“Hypatia in the Patent Office: Women Inventors and the Law, 1865–1900.” The American Journal of Legal History*, vol. 35, no. 3. *Crossref*, doi:10.2307/845974

১৬ Ogilvie, Marilyn Bailey and Joy Dorothy Harvey (1999). The Biographical Dictionary of Women in Science: Pioneering Lives from Ancient Times to the Mid-20th Century (2 Volume Set). Routledge.

১৭ Santilli, Elena (2017). *“Female Doctors in Ancient China: Comparative Studies Through Literature and Science.”* Healthcare Policies and Systems in Europe and China. Crossref, doi:10.1142/9789813231221 _0016.

১৮ Schiebinger, Londa (1987). “The History and Philosophy of Women in Science: A Review Essay.” vol. 12, no. 2. www.jstor.org/stable/3173988. Accessed 6 Aug. 2021.

১৯ Shearer, Benjamin and Barbara Smith Shearer (1996). *Notable Women in the Life Sciences*. Amsterdam University Press, Amsterdam, Netherlands.

২০ Yuan, Lijun (2002) “Ethics of Care and Concept of Jen: A Reply to Chenyang Li.” *Hypatia*, vol. 17, no. *Crossref*, doi:10.1353/hyp.2002.0024